বিশ্ব ক্ষুধা সূচক নিয়ে নানা বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও ভারতের নিম্নগামী অবস্থান এক তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত

যত অসাম্য ততই ক্ষুধা, এটা বোঝা জরুরি




বৈষম্য, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই যে কোনও একটির বৃদ্ধিই উদ্বেগের। লিখছেন **বিশ্বজিৎ মণ্ডল** ও **সৈকত সরকার**



আইস্টক

কিছু বিষয় আছে যেগুলি নিজে অনুভব না করলে অনুধাবন করা যায় না। যেমন, একাকিত্ব, অপারেশন টেবিলে অজ্ঞান হওয়ার আগের মানসিক অবস্থা, বেকার থাকার পর চাকরির চিঠি হাতে পাওয়া, আরও কত কী! তেমনই খিদে এবং খিদের যন্ত্রণা। তবে এ দুটো কিন্তু ঠিক এক বিষয় নয়। খিদে তো উপোসিরও হয়। তাতে যন্ত্রণা থাকলেও বাধ্যবাধকতা থাকে না। অন্য দিকে খিদের যন্ত্রণা হল বাধ্যবাধকতা। বাধ্যবাধকতা এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি যেখানে চাইলেই খিদের উপশম হয় না, আজ খাবার জুটলেও আগামীর নিশ্চয়তা নেই, রাষ্ট্র খাবার সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ। অনেকে অবশ্য বলবেন পেটে খিদের জ্বালা না থাকলে দায়িত্ববোধ তৈরি হয় না। সে গল্প আলাদা। কারণ, সে ধরনের খিদের তাড়নায় মানসিক ও শারীরিক ভাবে অপুষ্ট শিশু জন্মায় না, শিশুর বিকাশ ব্যাহত হয় না, শিশু শ্রমিক ইমারতি দ্রব্য মাথায় বয়ে বেড়ায় না। তাই যন্ত্রণাকাতর খিদের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রভাব গভীর। অতএব, আলোচনা ও বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে আমাদের দেশ যখন খিদে ও তৎসম্পর্কিত সমস্যার খতিয়ানে বেশ বেকায়দার সম্মুখীন।

সূচকের এ দিক, ও দিক

অতি সম্প্রতি দু'টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রিপোর্টে উঠে এসেছে যে আমাদের দেশ নাকি খুব খারাপ ফল করেছে বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকের মাপকাঠিতে। এই সূচকের সূত্রপাত ২০০৬ সালে। আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সিটিউট এবং জার্মানির ওয়েলথহাঙ্গারিলফে মিলে প্রকাশ করে প্রথম রিপোর্ট। পরে ২০০৭ সালে এদের সঙ্গে যোগ দেয় আরও একটি আইরিশ অসরকারি সংস্থা কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, এবং ২০১৮-তে ছেড়ে যায় আমেরিকার সংস্থাটি।

স্বাভাবিক ভাবে জানতে ইচ্ছে করে যে এই পরিমাপ পদ্ধতি কী? এটি এমন একটি সূচক যা পৃথিবীব্যাপী মানুষের ক্ষুধার তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত। যে দেশে খিদের জ্বালা যত বেশি, ক্ষুধা সূচকের তালিকায় সেই দেশের স্থান নীচের দিকে। এখানে শুধু সংখ্যাভিত্তিক মূল্যায়নের দিকে নজর দেওয়া হয় বলে এমন অনেক বিষয় বাদ পড়ে যায় যেগুলি সার্বিক বিকাশের অন্যতম স্তম্ভ। শুধু সংখ্যাভিত্তিক তথ্য আর যা-ই হোক, বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ রূপে তুলে ধরতে সব সময় সক্ষম হয় না। সাধারণত, যখন কোনও বিষয়ের পরিমাপ ও প্রভাব শুধু সংখ্যার দ্বারা মূল্যায়িত হয় তখন সেই বিষয় সম্পর্কিত নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও নজর রাখতে হয়। যেমন, সূচকের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপাদান, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো, সামাজিক বিন্যাস, নাগরিক সমাজের ভূমিকা ইত্যাদি।

ক্ষুধা ও অপুষ্টির নাগপাশে শিশু

ফেরা যাক ভারতের অবস্থান প্রসঙ্গে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ক্ষুধা সূচকে ভারত (১০৭) ২৯.১ স্কোর করে প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা (৬৪), নেপাল (৮১), বাংলাদেশ (৮৪), ও পাকিস্তানের (৯৯) থেকেও পিছিয়ে আছে। শুধু তা-ই নয়, গত কয়েক বছর ধরে ভারতের স্থান ক্রমাগত নিম্নগামী।

এই সূচক নির্ণয়ে চারটি বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে:

- কত শতাংশ মানুষ পর্যাপ্ত ক্যালোরি পায়নি (আন্ডারনরিশমেন্ট);
- পাঁচ বছরের চেয়ে কম বয়সী কত শতাংশ শিশুর উচ্চতা ওজনের তুলনায় প্রামাণ্য উচ্চতার চেয়ে কম (চাইল্ড স্টান্টিং);
- পাঁচ বছরের চেয়ে কম বয়সী কত শতাংশ শিশুর ওজন উচ্চতার তুলনায় প্রামাণ্য ওজনের চেয়ে কম (চাইল্ড ওয়েস্টিং);
- পাঁচ বছরের চেয়ে কম বয়সী কত শতাংশ শিশুর মৃত্যু হয়েছে (চাইল্ড মর্টালিটি)।

এই সব নির্ণায়কগুলিতে ভারতের মান শুধু খারাপ নয়, যথেষ্ট আশঙ্কাজনক।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে শিশুদের উপর। কারণ, এরাই ঠিক করবে ভবিষ্যৎ মানব মূলধনের ধরন এবং উৎপাদনশীলতা। তাই শিশুদের উপর ভিত্তি করে ক্ষুধা সূচকের নির্মাণ যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, ভারতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২ লক্ষ। সংখ্যাটা যেমন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ঠিক তেমনই চিন্তার বিষয়। উৎপাদনশীল শ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা যায় এ কথা সত্যি। কিন্তু সেই 'শ্রম' শব্দটি যখন শিশুর 'পরে' যুক্ত হয়, তখন সেটা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে বই কি। এবার বাকি থাকল অপুষ্টি। অপুষ্টি প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, যে শিশু দৈনন্দিন পরিশ্রম করে খিদে মেটাতে ব্যস্ত তার কাছে শিক্ষা, পুষ্টি, সিনেমা, উৎসব সবই এক গোত্রের চাহিদা। যে শিশু বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তার কাছে দু'বেলা পেট ভরে ভাত খাওয়ার চাইতে অত্যাবশ্যক আর কিছু হতে পারে না। অর্থনীতির ভাষায় সেই শিশুর কাছে খিদে আবশ্যক ও অন্য সব বিলাসিতা। সুতরাং, খিদের নিরসন করা প্রয়োজন জরুরি ভিত্তিতে।

> বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে শিশুদের উপর। কারণ, এরাই ঠিক করবে ভবিষ্যৎ মানব মূলধনের ধরন এবং উৎপাদনশীলতা। তাই শিশুদের উপর ভিত্তি করে ক্ষুধা সূচকের নির্মাণ যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ।

সূচক কতটা ভরসাযোগ্য

ভারতের মতো দেশে ১৪০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৩ হাজার জনের মতামতের ওপর ভিত্তি করে কোনও সূচক গঠন যে সমস্যাজনক, তা সহজবোধ্য। খানিকটা সমুদ্রের তীরে পা ভিজিয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপার মতো। দ্বিতীয় সমস্যা, সূচক নির্ধারণে নারীর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব না দেওয়া। কারণ, কোনও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বোঝার জন্য সে দেশের শিশুদের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনই নারীর ক্ষমতায়নের ভূমিকাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন এক দিকে যেমন লিঙ্গ-সমতার প্রতিচ্ছবি, অন্য দিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশক। নারীর ক্ষমতায়নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নারী শিক্ষা। নারী শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে কমে শিশুমৃত্যুর হার। বাড়ে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক যোগদানের সংখ্যা, মানবসম্পদ, উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপ্তি। কিন্তু এই সূচকে সরাসরি নারীর স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও শিশুর স্বাস্থ্য থেকে খানিক আন্দাজ করা যায়। তবুও সেটা পর্যাপ্ত নয় বলেই আমাদের ধারণা। এবং তৃতীয়ত, ক্ষুধা সূচক নির্ণয়ে শিশু স্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য গুলি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকেও পাওয়া যেতে পারে। এবং সেই রিপোর্টে নমুনা সংখ্যাটাও যথেষ্ট বেশি। তাই ক্ষুধা সূচক নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সেই রিপোর্ট থেকে নেওয়া যেতেই পারত। তা ছাড়া অপুষ্টি প্রসঙ্গে বডি মাস ইনডেক্সকেও অন্যতম নির্ণায়ক হিসেবে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ, মোটের ওপর বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক আর যা-ই হোক না কেন, কোনও দেশের সমগ্র আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিচায়ক নয়।

তবুও তো আছে কিছু...

নানা ত্রুটি ও বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও এই সূচক একটি বিশেষ দিকে সতর্ক করেছে, সেটি হল ক্ষুধা। অর্থাৎ, সমাজে অভুক্ত অবস্থায় থাকা মানুষের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। সেটি সংখ্যায় বেশি না কম তা অবশ্য বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। এ বিষয়ে রাজনৈতিক কলহে না গিয়ে বরং একটি সহজ, আপাত-নিরীহ কিন্তু কার্যকরী সমাধানের কথা উল্লেখ করা যাক। ক্ষুধার রাজ্যে দারিদ্র একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম কারণ তো বটেই। তবে মনে রাখতে হবে যে দারিদ্র শুধু খাদ্যের জোগানের অভাব থেকেই হয় না, খাদ্য বণ্টনে বৈষম্য ও অসমতা থেকেও সৃষ্টি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেন যে, ওই সময় খাদ্য সরবরাহ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও বণ্টনের সমস্যা থাকার কারণে গ্রামের দরিদ্র মানুষ খাবার কেনার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছিল। যার ফলে গ্রাম বাংলার মানুষ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ, সম্পদ বা আয় থাকলেই হবে না, তার সুষম এবং পরিকল্পিত বণ্টনও আবশ্যক।

প্রসঙ্গত, নানা সামাজিক অসাম্যের কারণেও স্বাস্থ্যের বণ্টনে অসাম্য সৃষ্টি হয়, এবং পর্যায়ক্রমে আসে আয়ের অসাম্য ও খাদ্য অসাম্য। এবং পরিশেষে যা পর্যবসিত হয় সার্বিক ভাবে খারাপ মানের মানব মূলধন গঠনের প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ, বৈশ্বিক ক্ষুধার তুলনামূলক আলোচনা আসলে নানা ধরনের আর্থসামাজিক অসাম্যের সামগ্রিক প্রতিফলন। এই ধ্রুব সত্যটি অনুধাবন করা জরুরি।

সুতরাং

শুরুতে যে কথা লিখেছিলাম সেটা খুব সঠিক কিনা তা নিয়ে নিজেরাই লেখার শেষে ধন্দে পড়ে গেছি। ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যরা যদি অনুভব না-ই করতে পারেন তা হলে সুকান্ত কী ভাবে লিখলেন, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/ পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' সমস্যা হল কবিদের মতো দরদি চোখ আর মরমি হৃদয় ক'জনের আছে? তাই মনে হয় মাটির সোঁদা গন্ধ গায়ে লেপ্টে থাকা মানুষ যত দিন না আমাদের প্রতিনিধি হয়ে পাকস্থলী গুলিয়ে উঠে আসা, দলা পাকানো খিদের কথা চিৎকার করে পার্লামেন্টে বলতে পারবেন তত দিন পর্যন্ত সূচক উড়বে ধূমায়িত কফি কাপের আনাচে-কানাচে, আর রুটিকে চাঁদ এবং নর্দমাকে পবিত্র নদী ভাবার মতো বিলাসিতা ছাড়া এ পোড়ার দেশে আর কিছু জোটা মুশকিল। তবুও সুস্থ গণতন্ত্রে কিছু সংখ্যক সংবেদনশীল প্রতিনিধির উপস্থিতি আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়? আপাতত সেই আশাতেই মরুক খিদের জ্বালায় ভুগতে থাকা চাষারা!

বিশ্বজিৎ মণ্ডল বিশ্বভারতীতে অর্থনীতির শিক্ষক। সৈকত সরকার আইআইএম ব্যাঙ্গালোর-এ সহকারী গবেষক।
মতামত ব্যক্তিগত